পাবলো পিকাসো ঃ ফিরে দেখা

দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

পাবলো পিকাসো দীর্ঘ ৯১ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর সৃষ্টির ব্যাপ্তিও ছিল বিশাল। বহুধাবিভক্ত তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব। ছোট একটি নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে গুছিয়ে বলা শক্ত। তবু শিল্পজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত প্রবন্ধকার নিজের অনুভবের প্রেক্ষাপটে পিকাসোর মূল্যায়ন করেছেন। তত্ত্ব ও তথ্য-ভিত্তিক এই নিবন্ধ আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে।

ইহবাদী পাশ্চাত্যদেশ বাস্তবকে এবং ভাববাদী ভারতবর্ষ 'আইডিয়ালিটি'কে শিল্পের মৌল ভিত্তি করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই গৌরবান্বিত শিল্প সৃষ্টি হয়েছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টির সেই শুরু থেকে ছবি এঁকে আসছে মানুষ। ভূমধ্যসাগর পারের মহাদেশ ইউরোপে বহু প্রাচীন কাল থেকে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ ও আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়পতাকা ওড়ানোর জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোলাবারুদের কালো ধোঁয়ায় নীল আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে গেছে, যার রেশ খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত দেখা গেছে। অবশ্য এখনো বন্ধের কোন লক্ষণ নেই। ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখি, এই মহাদেশটি সমুদ্রবেষ্টিত। আল্পস পর্বতকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় দেশে বিভক্ত। এইসব দেশ স্বভাবতই নৌশক্তিতে বলীয়ান ছিল। সামরিক শক্তির পাশাপাশি গান-বাজনা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানচর্চাকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল তারা। সেখানে গুণী শিল্পীদের রাজ-অনুগ্রহ পেতে অসুবিধা হয়নি। রাজার নির্দেশে ভাল শিল্পীদের খুঁজে নিয়ে আসত রাজকর্মচারীরা। চার্চের দেওয়ালে যিশুর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতেন তাঁরা।

দেওয়ালে ছবি আঁকার ব্যাপারটা বহু প্রাচীন। প্রায় কুড়িহাজার বছর আগে বন্য যাযাবর মানুষ পর্বতগাত্রে উন্নত মানের বাইসনের ছবি এঁকেছে আর্থ কালার (Earth Colour)-এর সাহায্যে—ফ্রান্সের লেলিক্স ও আলতমিরা গুহাতে।

প্রায় দুশো বছর আগে 'রিয়েলিজম্'-এর পর থেকে আধুনিক চিত্রকলার শুরু। ইমপ্রেসেনিজম্ ধারার পরবর্তী সময়ে পল সেজান জোরালো ফর্ম-নির্ভর ছবি করেন—যা পাবলো পিকাসোকে ফর্ম-নির্ভর ছবি নিয়ে গবেষণার দিকে ঠেলে দেয়। পাবলো পিকাসো স্পেনের মালাগার আন্দালুসিয়ায় ১৮৮১ সালের ২৫ অক্টোবর জন্মেছিলেন। বাবা হোসে রুইজ ব্লাসকো ও মা মারিয়া পিকাসো লোপেজের বড় ছেলে তিনি। তাঁর ভাইয়ের নাম 'ডঞ্জো' (Donjo)। বাবা স্থানীয় আর্ট কলেজের অঙ্কনশিক্ষক ছিলেন। বাবার কাছেই তাঁর চিত্রকলায় হাতেখড়ি। তিনি ছোটবেলায় স্কুলে যেতে চাইতেন না। বন্ধুদের সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে, বাবার সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই দেখে সময় কাটাতেন—তার সঙ্গে ছবি আঁকা তো ছিলই। বাবার অসমাপ্ত ছবিগুলিতে ছোট ছোট আঁচড় টেনে শেষ করা ছিল তাঁর অন্যতম খেলা। ১৪ বছর বয়সে তিনি রেনেসাঁ ও পরবর্তী কালে অন্য শিল্পীদের মতো চিত্রকলায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে স্পেনের বার্সিলোনাতে তিনি La Lonza Academy-তে ভর্তির জন্য যান।

এর পরে পিকাসোর জীবনে একটা বড় বাঁক আসে। ১৯০০ সালে তিনি প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিস হলো তৎকালীন বিশ্বের চিত্রকলার রাজধানী—তাবৎ বিশ্বের বহু শিল্পরসিক, শিল্পী, কবি, আর্ট-ডিলারদের ভিড়। এখানে মডার্ণ আর্ট-এর বিভিন্ন গতিপ্রকৃতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এর প্রভাব এখনো বর্তমান। প্যারিসে এলে তিনি মাঝে মাঝে নিজের বাড়ি ঘুরে যেতেন। ১৯০৪ সালে এক কবি-বন্ধু ফারনাণ্ডি অলিভিয়েরার সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। এইসময়ে তিনি সন্ধ্যাটা প্যারিসের কাফে, রেস্টুরেণ্টে বন্ধু-পরিবৃত হয়ে কাটাতেন। তিনি যে-বাড়িতে উঠেছিলেন—সেখানকার মালিকের পছন্দ হয়নি পিকাসোর কাজকর্ম, রকমসকম এবং তাঁকে বেশিদিন থাকতে দিতেও রাজি হননি। অবশ্য পরবর্তী কালে পিকাসোর নামযশ হওয়ার পর তাঁর থেকে ছবি কিনে তিনি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

তখন গভীর রাত—পান্থশালাগুলো সবে ফাঁকা হতে শুরু করেছে। মমার্তের (প্যারিস) এক নির্জন রাস্তায় গাঢ় অন্ধকার আর বরফঠাণ্ডা হওয়াকে ভেদ করে ঘোড়ার গাড়ি করে তৎকালীন স্টুডিও 'রুরডিঞ'-র দিকে এক সুবেশ পুরুষ মুখে চুরুট নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পাশে সিটের ওপর টুপিটি রাখা আছে। হাতের চেটো দিয়ে চোখের ওপর হাত বোলালেন তিনি। চোখদুটো জ্বালা জ্বালা করছে। গত কয়েকদিন ধরে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় 'ভিখারি', 'গিটার' ইত্যাদি ছবি আঁকতে হয়েছে তাঁকে। শরীর, মন ক্লান্ত। 'রুরডিঞ'-এর দরজায় আসতেই পিকাসোর মনে পড়ল—'ভিখারি' ছবিটির ফিনিশিং বাকি। মনে মনে ভাবলেন, এই ছবিগুলো যদি না দাঁড়ায় তাহলে সর্বনাশ! সব ভুলে গিয়ে রঙ-তুলি-ইজেল নিয়ে তিনি আবার ছবি আঁকতে মেতে গেলেন। ছবি আঁকতে আঁকতে

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে নেই। ঘড়ির এলার্মের শব্দে সূর্যোদয়ের আগেই ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে পড়ল, ফুলের তোড়াগুলো শুকিয়ে গেছে ঘরের বিভিন্ন অলিন্দে। বেরিয়ে পড়লেন ফুলের তোড়া কিনতে। রাস্তায় রক্তিমাভ সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। তার মধ্য দিয়ে পিকাসো হেঁটে চলেছেন। মনে তখন এক অনবদ্য সৃষ্টির রূপকল্পনা তাঁকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এই স্পেনীয় শিল্পীর সমালোচনা-আলোচনা তৎকালীন সমাজে কম হয়নি। আবার একথাও সত্য, সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের খুব কম শিল্পীই তাঁর প্রভাব এড়িয়ে কাজ করতে পেরেছেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পিকাসোর স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে নীলপর্ব, গোলাপীপর্ব, কিউবিজম্, (পরিদৃশ্যমান জগতের ভূমিভাগ, উদ্ভিদ, ঘরবাড়ি, আকাশ, দেহাবয়ব প্রভৃতিকে জ্যামিতিক আকার ও ঘনক্ষেত্রে রূপান্তর) কোলাজ প্রভৃতি নব নব ধারার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। গ্রাফিক্স, ভাস্কর্য ও পটারীর ওপরেও তিনি যুগান্তকারী কাজ করেছেন।

আধুনিক কালের অন্যান্য কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী হলেন—ম্যাতিস, পল ক্লী, কান্দিনস্কি, মিরো, ব্রাক, রুয়াল্ট, শাগাল, সালভাদোরদালী, ম্যালভিচ, মন্দ্রিয়ান, জ্যাক্সন পোলক ও হেনরী মূর প্রমুখ। কিন্তু পিকাসোর কাজে একটা রহস্যময়তা আছে। দুঃখ, হতাশা, জীবনের নানান গতিময়তা, উদ্দামতা মেশানো তাঁর ছবি যেন সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার আবেগজারিত একটি মানুষের অনন্য জীবনচিত্র। তিনি লিখেছিলেন ঃ "I do not paint what I see, I paint what I know."—আমি যা দেখি তা আমি আঁকি না, আমি যা জানি তা-ই আঁকি। অন্যত্র লিখেছিলেন ঃ "Why would I try to imitate nature? I might just as well try to trace the perfect circle."—প্রকৃতিকে অনুসরণ করব কেন? বরং একটি নিখুঁত বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করি।

শিল্পজগতে তিনি নিঃসন্দেহে এক বড়মাপের সাধক। তিনি একাধিক বিবাহ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন যথেষ্ট। তাঁর এই মানসিক আঘাতের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে 'Weeping woman' বা 'ক্রন্দনরতা মহিলা' ছবিতে। ১৯৩৭ সালের কোন একসময়ে আঁকা হয়েছিল এই ছবি। শিল্প-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ছবির সঙ্গে তাঁর 'গার্ণিকা' (Guernica) ছবির যোগসূত্র আছে। এবং ঐসময়ে তাঁর নাকি প্রচণ্ড মাথাধরা বা মাইগ্রেনের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। লণ্ডনের 'Guardian News'-এর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে কিছুদিন আগে 'The Hindusthan Times' এই প্রসঙ্গে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল তাঁর। লাল, হলুদ প্রভৃতি রঙের সাহায্যে তাঁর এই ছবিটিতে যে আধা বিমূর্ত ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা এযুগের শিল্পকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে, মিলাব তাই জীবনগানে।"

স্পেনের মানুষ হলেও জীবনের বেশির ভাগ সময়ই পিকাসো ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন। তবে স্পেনের চিত্রকলার ঐতিহ্য থেকে খুব একটা সরে আসেননি তিনি। তাই তিন দিকপাল—এল গ্রেকো, ভেলাসকেথ ও গাইয়ারকে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। পিকাসোর মৃত্যুর পর ২৯ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। প্রথাকরণ (technique) ও বিষয়ের নিত্যনতুন ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু পিকাসোর গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। বস্তুত, তাঁর ভিতরের কবিত্ব এবং শিল্পীর প্রতিভা একত্র সমন্বিত হয়ে এক অপূর্ব শৈলীধারা আবির্ভূত হয়েছে। তিনি একটি নতুন প্রথা থেকে আরেকটি নতুন প্রথার জন্ম দিয়েছেন। ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন শিল্পকর্ম। চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ১৯৫১ সালে নির্মাণ করেছেন—'গর্ভবতী ছাগল' (ভাস্কর্য), 'ফুলদানি' (ভাস্কর্য) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বহুবর্ণের লিনোকাট' রচনা করেছেন ১৯৬২ সালে।

১৯৩২ সাল ও তার নিকটবর্তী সময়ে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিনের পাতা, বিল, টিকিট ইত্যাদি থেকে তিনি 'কোলাজ' সৃষ্টি করেন। বস্তুত, 'collect' শব্দ থেকেই 'কোলাজ'-এর উৎপত্তি। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রথা। এই নতুনত্বের ব্যাপারটা 'গার্ণিকা'র ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এতে যে 'চিত্রভাষা'র সৃষ্টি হয়েছে, তা এককথায় যুগান্তকারী। আসলে 'গার্ণিকা' একটি বৃহৎ ছবি (২৫×১১ ফুট)। Basgue-এর রাজধানী 'গার্ণিকা'র ওপর প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ করে জার্মানি ১৯৩৭-এর ২৬ এপ্রিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ছবিটি ঐ আক্রমণেরই প্রতিক্রিয়া। 'The Family of Saltinebangues' (সালটিম্ব্যাঙকুয়ের পরিবার) ছবিটিও ১৯০৫ সালে আঁকা বড়মাপের এক চিত্র। এটি পিকাসোর নীলপর্বের পরবর্তী কালের—অর্থাৎ 'rose period' বা গোলাপী পর্বের ছবি। সার্কাসের বিভিন্ন মানুষ ও কর্মীর বৈশিষ্ট্য এতে ধরা পড়ে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন মোটাসোটা বয়স্ক মানুষ, দুজন এক্রোব্যাট এবং একজন যুবতী নর্তকী। যেন এরা কিছু সময়ের জন্য চুপচাপ। কথা বলছে না। কী যেন ভাবছে!

মধ্যবয়সে পিকাসোর একটা অদ্ভুত ক্যারিশমা লক্ষ্য করা যেত। তাঁর ছবির পাশাপাশি একটা দেখনদারী

হাবভাব, পাঁচটি বিবাহ, কাব্য ও সাহিত্যচর্চা, সাধারণ জীবজন্তুর প্রতি বিশেষ প্রেম, অন্যদিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক টেনশন ইত্যাদি সবকিছু তাঁর জীবনে একটা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। এবং সেটা যেন নতুন নতুন সৃষ্টির অনুঘটকের কাজ করত।

পিকাসোর 'The Africiando' (দি আফ্রিসিয়ানদো) ছবিটি ১৯১২ সালে আঁকা। এটি বিশ্লেষণী ঘনকবাদ এবং সংশ্লেষণী ঘনকবাদের মধ্যবর্তী সময়ের। এতে 'form'-এর 'overlapping' এবং রঙের প্রাচুর্য দেখা যায়। 'Still life' (স্থিরচিত্র)[২] ছবিটি ১৯০৮-এ আঁকা। এই ছবিতে পল সেজানের বস্তুর গঠনবৈশিষ্ট্যের ওপর নতুন কিছু সংযোজন করে পিকাসো যুগান্তকারী 'কিউবিজম্'-এর সৃষ্টি করেন। এতে তিনটি তলের বিভ্রম সৃষ্টি করা যায়। এই ধরনের কাজের অনুবর্তী কিছু কাজ এদেশে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন ছবিতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিকাসোর ছবির পাশাপাশি রামকিঙ্কর বেজের ছবিও ইউরোপে কোন কোন গ্যালারিতে দেখানো হয়েছে।

বাল্যকালে পিকাসো কিছুদিন আইবেরিয়ান উপদ্বীপে কাটিয়েছেন। সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক অবস্থান, আকাশে-বাতাসে ভূমধ্যসাগরীয় স্নিগ্ধতা, স্থানে স্থানে রোমক ও ঔপনিবেশিক দুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রাথমিকভাবে পিকাসোর মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন ড্রইং এবং ল্যাণ্ডস্কেপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'The Three Musicians' (তিন সঙ্গীতশিল্পী) ছবিটি পিকাসো ১৯২১ সালে এঁকেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, এখানে তাঁর ছবির মধ্যে ক্রমশ কিউবিজমের অনুপ্রবেশ ঘটছে। রঙের মার্জিত ব্যবহারও এই ছবিতে লক্ষণীয়। চন্দ্রালোকিত কল্পরাজ্যে রেকর্ডের গান, পরিচিত ও অপরিচিত মানুষদের নিয়ে একটা রহস্যময়তার জাল বুনতে এই ছবি সাহায্য করে। সমসাময়িক ইউরোপ ও আমেরিকার চালচিত্রটি তখন এইরকম ঃ ফবিজম্, বাড-হাউস-প্রভাবিত শিল্পকলা একদিকে, অপরদিকে জার্মান এক্সপ্রেসেনিস্টদের আবেগজাত শিল্পকর্ম, আবার অন্যদিকে বোতল, সাইকেলের চাকা ইত্যাদি ব্যবহারে করে অপ ও পপ আর্ট[৩], জিওকমবাল্লার গতিবাদী ছবি, ইনস্টোলেশনের[৪] কাজকর্ম ইত্যাদি মিলিয়ে দুই মহাদেশ তখন আলোড়িত হচ্ছে।

৮ এপ্রিল ১৯৭৩-এ পিকাসো শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার কিছুদিন আগে থেকেই তাঁর শারীরিক অপুটতা প্রকট হয়ে ওঠে, যদিও মানসিক দিক দিয়ে তিনি সতেজ ছিলেন। কোন ফটোগ্রাফার এই সময়ে তাঁর ছবি তুলেছিল। সেই ছবিতে দেখা যায়, পিকাসো হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো করে পাঁচটি লম্বাটে বানরুটি সাজিয়ে একদৃষ্টিতে সেগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হয়, অনেক কথা তাঁর বলার আছে, কিন্তু বলতে পারছেন না। তাই চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পিকাসোর এক-একটা ছবির মধ্যে অদ্ভুত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই 'ভাব'-এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তখন ফটোগ্রাফি এবং যান্ত্রিক শিল্পকর্ম পাশ্চাত্য দেশে শুরু হয়েছে। বিবেকানন্দের মতে ঃ "যন্ত্রের সাহায্য নিলে অরিজিন্যালিটি লোপ পেয়ে যায়।... আগেকার ভাস্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নতুন নতুন ভাব বের করতেন বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে।" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য')

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, 'Dissertation on Paintings' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ "The first thing required for a painter to develop the higher faculty is that he must have the reverence, purity, the great love and fervour for the Ideal which he is going to represent." এই 'Ideal'-এর ব্যাখ্যা করে অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ "What is devotion to a religions man, what is philosophy to a thinker, the very same is the Ideal of a painter."

কলকাতায় পিকাসোর চিত্রবর্ণ ও ভাস্কর্য (ভারত ও ফ্রান্সের বিনিময়-সূচীর অন্তর্গত) প্রদর্শন এখনো যদিও হয়নি, কিন্তু ভারতের রাজধানী দিল্লি ও মুম্বাইতে অবশ্য এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। তবু কলকাতার চিত্রমোদী মানুষ পিকাসোকে দূরের মানুষ বলে মনে করেন না, বরং পিকাসো তাঁদের কাছের মানুষ। ❑

১ গ্রাফিক্সের একটি ধারা লিনোকাট। সহজ কথায় একধরনের ছাপচিত্রও বলা যেতে পারে। একটু মোটা ধরনের রবারের পটের একদিকের তলের উঁচু-নিচু ভাব ও টেকশ্চারকে কাজে লাগিয়ে সাধারণত কালো কালির সাহায্যে ছাপচিত্র করা হয়। আমরা এর নিদর্শন পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্রগুলিতে।

২ এটি মূলত শিল্পশিক্ষণ পর্বে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর আকার, আয়তন, তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুর দূরত্ব (একদিকে কোন আলোর উৎস থেকে) অঙ্কনের অনুশীলন করা হয়। বহু গুণী শিল্পী স্টিল লাইফ এঁকেছেন, কিন্তু পিকাসো, ম্যাতিস প্রমুখ এই বিষয় নিয়ে চিত্র অঙ্কন করে আধুনিক চিত্রকলার মহিমা বৃদ্ধি করেছেন।

৩ আধুনিক চিত্রকলায় ১৯৪০-১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রচলিত একটি ধারা। পুরনো গুরুগম্ভীর ভাব ও ব্যাকরণকে অস্বীকার করে সমসাময়িক সিনেমা, গান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিষয় থেকে ছবি আঁকাই অপ ও পপ আর্টের বৈশিষ্ট্য। আমেরিকা-ইউরোপের মধ্যেই তখন এই ধারাটি সীমাবদ্ধ ছিল।

৪ বিশ্ব চিত্রকলায় এর আবির্ভাব ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে। বেশ কয়েকটি বিভাজিত বস্তু নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন করে সামগ্রিকভাবে তার মূর্ছনা সৃষ্টি করা হয়।